বই সংকটে লেখাপড়া ব্যাহত

শরীফুল আলম সুমন

১৯ জানুয়ারি, ২০২৫
০০:০০

শেয়ার
অ +
অ -

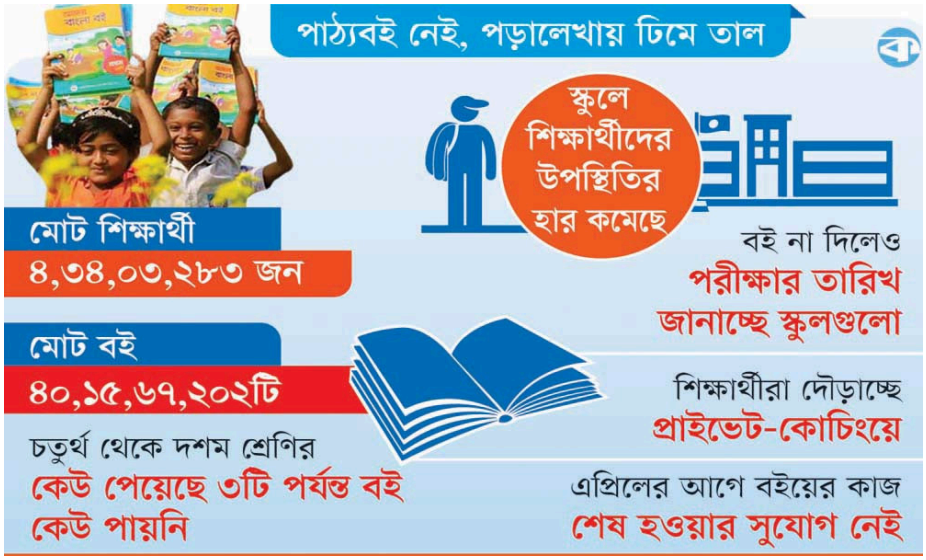

নতুন বছর শুরুর আগেই এক বছরের শিক্ষাপঞ্জি প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে এক বছরে কত দিন ক্লাস হবে, পরীক্ষা নেওয়া হবে কবে—এসবের উল্লেখ থাকে। যেসব স্কুল শিক্ষাপঞ্জির বাইরে আরো কিছু পরীক্ষা নেয়, তারাও বছরের শুরুতে সেটা ঠিক করে দেয়। কিন্তু ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও এবার এখনো বেশির ভাগ শিক্ষার্থী পাঠ্যবই হাতে পায়নি।

বই নিয়ে চলছে রীতিমতো হাহাকার। এরই মধ্যে নতুন বছরের ১৮ দিন পার হলেও বই না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখাও অনেকটা বন্ধ। শুরুতেই শিক্ষার্থীরা পাঠে এমন হোঁচট খাওয়ায় অভিভাবকরাও চিন্তিত।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আশা করছে, আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব শিক্ষার্থীর হাতে সব বই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

যদিও প্রেস মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এপ্রিলের আগে সব বইয়ের কাজ শেষ হওয়ার সুযোগ কম। আগেও বছরের প্রথম দিন বই উৎসব করা হলেও সব বইয়ের কাজ শেষ করতে ফেব্রুয়ারি মাস লেগে যেত। তবে নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অন্তত ৮০ শতাংশ বইয়ের কাজ শেষ হয়ে যেত। এতে কোনো কোনো স্কুলে সামান্য বই দেওয়া বাদ থাকলেও তা নিয়ে তেমন কথা উঠত না।

কিন্তু এ বছরের ঘটনা উল্টো। এ পর্যন্ত প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির বেশির ভাগ শিক্ষার্থী বই পেলেও চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণির মাত্র তিনটি পর্যন্ত বই পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। কিছু ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থী সেটাও পায়নি।

সম্প্রতি শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই শিক্ষার্থীরা সব পাঠ্যবই হাতে পাবে। আমরা (বই ছাপা) কার্যক্রম শুরু করেছি দেরিতে।

আমাদের বই পরিমার্জন করতে হয়েছে। বইয়ের সিলেবাস, কারিকুলাম নতুন করে করতে হয়েছে। বইয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এতে তো দেরি হবেই। আগের সরকারের আমলে মার্চের আগে পুরোপুরি বই দেওয়া হয়নি।’

শিক্ষা উপদেষ্টা আরো বলেন, ‘প্রথম দিকে আমরা আর্ট পেপার পাচ্ছিলাম না। কাগজের সংকটও ছিল। পরবর্তী সময়ে ছাত্র প্রতিনিধি, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও অন্যদের সহায়তায় আর্ট পেপারের সমস্যা সমাধান হয়েছে। (আর্ট পেপার নিয়ে) বিদেশ থেকে জাহাজ রওনা হয়ে গেছে। আশা করছি, জানুয়ারির শেষ দিকে জাহাজ এসে পৌঁছাবে।’

তবে গতকাল শনিবার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলামের কাছে পাঠ্যবই ছাপার কাজ কবে নাগাদ শেষ হতে পারে, এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতির সভাপতি তোফায়েল আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি থেকে আমাদের ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব বইয়ের কাজ শেষ করতে বলেছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। তবে বাস্তবতা ভিন্ন। এখন আমরা গতি বাড়িয়েও প্রতিদিন ৩০ লাখ বই দিতে পারছি। সেটা হয়তো সামনে ৪০ লাখ পর্যন্ত হতে পারে। তার পরও মন্ত্রণালয়ের সময় অনুযায়ী বইয়ের কাজ শেষ করা কষ্টকর হয়ে পড়বে।’

সূত্র জানায়, পাঠ্যবই না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ কমেছে। ফলে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও কমেছে। শিক্ষকদের বই ডাউনলোড করে পড়াতে বলা হলেও শিক্ষার্থীদের হাতে কপি না থাকায় তাতে কারো আগ্রহ তৈরি হচ্ছে না। এতে স্কুলগুলোতে হচ্ছে মাত্র দু-একটি ক্লাস। শিক্ষকরা গল্পগুজব করে চলে যাচ্ছেন। আবার বেশির ভাগ স্কুলে এত দিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চললেও সেটাও শেষের পথে। আবার যেসব শিক্ষার্থী খেলাধুলায় অংশ নিচ্ছে না তারা স্কুলে আসছে না।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কিশলয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মো. রহমত উল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমাদের স্কুলে দু-একটি শ্রেণি বাদে প্রায় সব শ্রেণিরই কিছু বই এসেছে। আমরা সেগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেছি। বর্তমানে ক্লাসের পাশাপাশি আমরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সময় বাড়িয়েছি। ক্লাসের জন্যও পূর্ণ সময় রেখেছি। কিন্তু সব বই না পাওয়ায় ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অনেকে নতুন শ্রেণিতে ভর্তিও হচ্ছে না।’

এর আগে কভিডের কারণে শিক্ষার্থীরা দুই বছর ঠিকমতো ক্লাস করতে পারেনি। এরপর ২০২৩ ও ২০২৪ সাল ছিল নতুন শিক্ষাক্রম, যেখানে তেমনভাবে পড়ালেখা ছিল না। এখন আবার শিক্ষার্থীরা বছরের শুরুতে বই না পেয়ে হতাশায় পড়েছে। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়ে ছুটছে প্রাইভেট-কোচিংয়ের পেছনে। আর অনেক স্কুল যারা ‘সিটি’ পরীক্ষা বা মাসিক পরীক্ষা নেয়, তারা বই দিতে না পারলেও শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার তারিখ জানিয়ে দিচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা অন্য কোনো উপায় না পেয়ে দৌড়াচ্ছে প্রাইভেট শিক্ষকদের পেছনে।

মনিপুর স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সাইফুল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘১৮ দিন চলে গেল, আমার বাচ্চা এখনো একটি বইও পায়নি। আগে কোনো পড়ালেখাই ছিল না। এখন বইয়ের অভাবে পড়ালেখা করানো যাচ্ছে না। যেহেতু বই নেই, ক্লাস ঠিকমতো হয় না, বাচ্চাও স্কুলে যেতে চায় না। আমরাও চাপ দিতে পারি না। বলতে পারেন পড়ালেখা বন্ধ।’

অভিভাবকরা বলছেন, পাঠ্যবই না পেলেও যদি সহায়ক বই পাওয়া যেত তাহলেও অন্তত পড়ালেখা চালিয়ে নেওয়া যেত। রাজধানীতে একজন শিক্ষকের কাছে ব্যাচে পড়লেও দিতে হয় এক হাজার ৫০০ থেকে দুই হাজার টাকা। সেই হিসাবে কমপক্ষে তিনজন শিক্ষকের কাছে পড়লে অনেক টাকার ব্যাপার। অথচ সহায়ক বই থাকলে চার-পাঁচ শ টাকায় একটি বই কিনে পড়ালেখাটা চালিয়ে নেওয়া যেত। যাঁদের পক্ষে প্রাইভেট পড়ানো সম্ভব নয়, তাঁরা পড়েছেন বিপদে।

সূত্র জানায়, পাঠ্যবই ছাপতে দেরি হওয়ায় সহায়ক বই ছাপার অনুমতি দিচ্ছে না জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। যেসব প্রকাশনী পাঠ্যবইয়ের কাজ করছে না তাদেরও সহায়ক বই ছাপার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এ অবস্থায়

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি থেকে এনসিটিবি বরাবর সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব দিয়ে সহায়ক বই ছাপার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। তারা পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত সব ধরনের প্রেস ও বাইন্ডারদের বাদ দিয়ে সহায়ক বই ছাপতে চায়। সহায়ক বই ও পাঠ্যবই ছাপানোর মেশিন ও কাগজ ভিন্ন হওয়ায় বই ছাপানোর ক্ষেত্রে কোনো বাধা হবে না বলে জানালেও কর্ণপাত করছে না এনসিটিবি। ফলে পাঠ্যবইয়ের সংকটের পাশাপাশি সহায়ক বইও না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বন্ধ রয়েছে।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, এবার প্রাক-প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার কোটি ৩৪ লাখ তিন হাজার ২৮৩। তাদের জন্য ছাপা হচ্ছে ৪০ কোটি ১৫ লাখ ৬৭ হাজার ২০২ কপি বই। প্রাথমিকের দুই কোটি ৯ লাখ ৪৪ হাজার ৪৭৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য ছাপানো হচ্ছে ৯ কোটি ১৯ লাখ ৫৪ হাজার ৩৫৫ কপি বই। মাধ্যমিক পর্যায়ের দুই কোটি ২৪ লাখ ৫৮ হাজার ৮০৪ জন শিক্ষার্থীর জন্য ছাপানো হচ্ছে ৩০ কোটি ৯৬ লাখ ১২ হাজার ৮৪৭ কপি বই। এ ছাড়া দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য সাড়ে আট হাজারের বেশি ব্রেইল বই ছাপা হচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য প্রায় ৪১ লাখ সহায়িকা বই ছাপা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এনসিটিবি সবচেয়ে বেশি অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ছাপার কাগজ নিয়ে। চাহিদামতো ৪০ কোটি বই ছাপাতে কত হাজার টন কাগজ প্রয়োজন এবং দেশে কাগজের এই সক্ষমতা আছে কি না সেটা তারা বিবেচনায় নেয়নি। ডিসেম্বর শেষে ছাপাখানাগুলো একসঙ্গে কাজ শুরু করতে গেলে কাগজের সংকট দেখা দেয়। ফলে কাজ থেমে যায়। এ ক্ষেত্রেও এনসিটিবি দায় চাপায় অন্যদের ওপর। ৪০ কোটি বই ছাপানোর জন্য যে পরিমাণ কাগজ প্রয়োজন, তা দেশের মিলগুলোর উৎপাদনে তিন মাসের মতো সময় লাগবে। আর যদি আমদানি করতে হয় তবে তা তিন মাস আগেই করা উচিত ছিল। এ ক্ষেত্রেও এনসিটিবি সিদ্ধান্ত নিতে সময়ক্ষেপণ করেছে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানকে সক্ষমতা থেকে বেশি কাজ দেওয়া হয়েছে। ফলে পাঠ্যবই ছাপা শেষ হতে দেরি হচ্ছে। এ অবস্থায় সব বইয়ের কাজ শেষ হতে এপ্রিল পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম রিয়াজুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘প্রাথমিকের ১০ কোটি বইয়ের মধ্যে আট কোটির কাজ শেষ হয়েছে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে প্রাথমিকের বইয়ের সব কাজ শেষ হবে। আমরা দশম শ্রেণির সব বইয়ের কাজও ৩১ জানুয়ারির মধ্যে শেষ করব। অন্যান্য শ্রেণির কিছু কিছু বই এরই মধ্যে দেওয়া হয়েছে। বাকি বইয়ের কাজ ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। কিছু প্রেস সক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত কাজ নিয়েছে। এখন যেসব প্রেসের কাজ শেষ হয়েছে, সেখানে আমরা নতুন করে কিছু কাজ দিয়ে দিচ্ছি।’

এনসিটিবির চেয়ারম্যান আরো বলেন, ‘বই ছাপা হলেও আমাদের সমস্যা বাইন্ডারের। এখন যদি সহায়ক বই ছাপার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে বাইন্ডারের অভাবে পাঠ্যইয়ের কাজের গতি কমবে। তাই পাঠ্যবই ছাপা শেষে সহায়ক বই ছাপার অনুমতি দেওয়া হবে। আশা করছি, ১৫ ফেব্রুয়ারির পর থেকে প্রকাশনীগুলো সহায়ক বই ছাপার কাজ শুরু করতে পারবে।’